কবি আর কবিতাপড়া : একটি বিতর্ক

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়, *সহকারী অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, বেথুন কলেজ, কোলকাতা-৬*

সারসংক্ষেপ ঃ

আধুনিক বাংলা কবিতার নানা পর্যায়ে আধুনিকতার নির্মাণ এক এক রকম। ১৯৬০-৭০ সময় পর্বে কবিতা পড়া, কথা আর সুর নিয়েও এই আধুনিকতার ধারণায় একটি আলোড়ন উঠেছিল। যার এক প্রান্তে ছিলেন সেদিনের প্রধান কবিরা অন্যদিকে অভিনেতা, আবৃত্তি শিল্পী আর বেতার জগতের কলাকুশলীরা। এই বিতর্কের মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কবিতা আর তার পাঠক-এর মধ্যে সংযোগ নিয়ে। পারফর্ম্যান্স-এ র শিল্পীরা কবিতাকে যেভাবে পৌঁছে দিতে চান তার সঙ্গে সরাসরি বিরোধে নেমে আসেন স্বয়ং কবি। অর্থ নিষ্পত্তির দুটি তরফে বোঝা যায় কবিতাও এক ক্ষমতাক্ষেত্র। কবি স্বয়ং হয়ে উঠতে চান উপস্থাপক। এই বিশেষ মুহূর্তটি আধুনিক বাংলা কবিতার নির্মাণে এক নতুন দিক এর ইশারা দিয়ে যায়। কবি এবং কবিতার উপস্থাপনা হয়ে ওঠে একটিই পরিকল্পের অংশ।

মূলশব্দগুচ্ছ ঃ আধুনিকতা, পারফরম্যান্স, পাঠ, শ্রোতা-পাঠক, ক্ষমতা-ক্ষেত্র, সাংস্কৃতিক পাঠ।

টমাস মান-এর একটি সুন্দর চিঠি আছে। টমাস মান লিখছেন : তুমি আমাকে ছোট করে লিখতে বলেছিলে, তাই অনেকদিন সময় লাগলো। কিছু ছোট করে বলতে গেলে অনেকখানি জানা দরকার। এই ছোট্টা প্রস্তাবে যে তর্ক তুলতে চাইছি, শুরুতেই বলা ভালো, আমি অতখানি জানিনা। কোনো রাগ ছোট করে গাইতে গেলে অনেক বড় গায়ক হতে হয়। আমি সে চেষ্টায় যাব না।

প্রথমেই এই ছোট্ট খসড়াটির শীর্ষক একটু পরিচ্ছন্ন করে বুঝে নেওয়া দরকার। 'কবি' আর 'কবিতা পড়া' কথাটার মধ্যে একজন কর্তা আছে। আর আছে একটা কাজ। সেই কাজ-এর একটা লক্ষ্য আছে। আছে একটা বিতর্ক। বিতর্কটা অদ্ভুত! সে হল কবিতাপড়া এই কাজ টাকে নিয়েই। সংযোগ নিয়ে। অর্থ তৈরী করার ক্ষমতা নিয়ে। কবিতা পড়া-কে যদি একটা কোনো পারফরম্যান্স বলি, সেই পারফরম্যান্সই এখানে হয়ে উঠেছে এক ক্ষমতাক্ষেত্র।

কবিতা পড়ার মধ্যে যে একটা অর্থ তৈরী করার প্রক্রিয়া চলে কে তার অধিকারী? কবি না পার ফরমার? অথবা পাঠক স্বয়ং নাকি কবিই হয়ে উঠতে চাইছেন পারফরমার? এই পারফরম্যান্স এর যুক্তি গুলো কী কী? নিয়ম গুলো কী কী? আর বিরোধই বা কোনখানে?

এইসব প্রশ্ন নিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার বিশেষ এক পর্যায়ে গড়ে ওঠে এক তুমুল বিতর্ক। যার এক প্রান্তে ছিলেন পেশাদার অভিনেতা, আবৃত্তিকার অন্যদিকে 'আধুনিকতা' কথাটার নতুন অর্থ করতে চাইছেন — এমন বাঙালী কবিরা।

২.

'আধুনিক বাংলা কবিতা' কথাটাকে এইখানে একটু ছোট করে মীমাংসা করে নেওয়া দরকার। 'আধুনিক' কথাটা নিয়ে প্রথম বিতন্ডা বাঁধে বিংশ শতকের বিশ-এর দশকের শেষে। মূল তর্ক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভক্তদলের সঙ্গে সে যুগের নতুন লিখতে আসা কবি আর ঔপন্যাসিকদের। ১৯৩০ এর দশকে বিতর্কটি থেমে গেলেও মনে রাখা দরকার এই তর্ক ছিলো মূলত উপন্যাসে 'ন্যাচারলইসম' বা 'রিয়ালিসম'-কে কেন্দ্র করে। কবিতার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব পরিচ্ছন্ন ছিলো না। ঠিক কোন আধুনিকতাবাদ-এর কথা এখানে বলা হচ্ছে? কখনো তা ইমেজিসম কখনো বা সোশ্যালিষ্ট রিয়ালইসম্-এর উল্লেখ থাকলেও নতুন কবিদের লেখায় আধুনিকতার একটাই কোনো লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। এই 'আধুনিক' কথাটাকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজানো হয় ঠিক বছর ৩০ পরে। ১৯৬০ এর গোটা দশক জুড়েই বাংলা কবিতা এবং তার আধুনিকতার ক্ষেত্রটি ইংরাজি ভাষা জগৎ থেকে সরে যাবে ফরাসি কবিতায়। এর একটা প্রান্ত যদি হয় ১৯৬১ সালে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু'র অনুবাদে 'শার্ল বোদল্যের ও তাঁর কবিতা' অন্য প্রান্তে স্মরণযোগ্য অরুণ মিত্র ও বিষ্ণু দে'র প্রবন্ধ মালা।[১]

এ আলোচনায় অবশ্য সেই আধুনিকতার সমস্ত বিশেষত্বে চোখ রাখা সম্ভব নয়। তবু একটি কথা মাথায় রাখতে চাই — এই সময়েই বাংলা কবিতা তার আঙ্গিক নিয়ে যাবতীয় তর্কের সঙ্গে খুব আশ্চর্য ভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলো কবিতা পড়ার সূত্রটিকেও। অর্থাৎ কবিতা পাঠ নয় তার পারফরম্যান্সও এখানে অনেকখানি গুরুত্ব নিয়ে আসবে। গুরুত্বের কেন্দ্রে ছিলো দুটি মূল কথা - ক) অর্থ উৎপত্তির প্রশ্ন আর খ) সংযোগের সমস্যা। আর একটি সূত্র - কবিতার নাটক!

কবিতা পড়া নিয়ে এখানে ছোট একটা প্ররিপ্রেক্ষিত মাথায় রাখা চাই। কবিদের কবিতা পড়া, বিশেষতঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে, বাংলা কবিতার ইতিহাসে এর আগে কিন্তু ততটা গুরুত্ব পায়নি। কখনো কখনো স্মৃতি কথায় আমরা শুনি মধুসূদন কিংবা বিহারীলাল-এর কবিতা পড়ার বিবরণ। কখনো নবীনচন্দ্র সেন, আনুষ্ঠানিক আবৃত্তি করছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কেমন ভাবে পড়ছেন এঁরা তার কোনো সচেতন বিবরণ থাকছে না কোথাও। নজরুল যে সভার মধ্যে কবিতা পড়ে মাতিয়ে দিচ্ছেন শ্রোতাকে একথা সত্য, কিন্তু তিনিও কবিতা পড়া বিষয়ে ভাবছেন না কিছু। অন্তত সেই ভাবনার লিখিত কোনো রূপ নেই আমাদের কাছে। একটা সুরেলা আবহে টেনে টেনে কখনো বা উদাত্ত গলায় কবিতা পড়তেন কবিরা। রবীন্দ্রনাথ থেকে নজরুল পর্যন্ত গড়িয়ে আসা এই সুরেলা আবৃত্তি হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে বুদ্ধদেব বসু কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতন কবিদের স্বকণ্ঠে পড়া কবিতায়। কিন্তু যে আধুনিকতা এঁদের অভীষ্ট ছিলো, কী ঘটছিলো সেই পশ্চিম ইউরোপীয় আধুনিকতার আবহে?

একটি ছোট্ট উদাহরণ তুলে নিই, ফরাসি কবিতার ভালেরি জানাচ্ছেন স্টেফাম মালার্মের নিচু গলার একটানা সুরেলা আবৃত্তি ওঁর কবিতা পড়া নিয়ে পরিপন্থী। আর ইংরেজি কবিতার জগতে T. S. Eliot, তাঁর কবিতা পড়া অনেক খানি সরিয়ে নিয়ে আসছেন সুরেলা পাঠ থেকে, তাঁর অভীষ্ট হয়ে উঠছে একটা কোন বাক্‌স্পন্দ। W. B. Yates, বা পাউন্ডের ধরণ থেকে অনেকখানি দূরে চলে আসছে কবিতা পাঠ। এই সময়েই Recording এর দৌলতে কবিরা গ্রামোফোন রেকর্ড-এ নিজেদের কবিতা পাঠ তুলে দিচ্ছেন উদ্দিষ্ট শ্রোতা অথবা পাঠকদের কাছে। অর্থাৎ কবিতা লেখা আর তার নানা কৃৎকৌশল নয় এমনকী কবিতা পড়ার মধ্যে দিয়ে যেন অর্থউৎপাদন বা সংযোগের একটা কোনো আবর্ত সচেতন ভাবে গড়ে তুলতে চাইছেন কবিরা। সেই সচেতনতাই বাংলা কবিতায় এসে হাজির হবে বছর কুড়ি পরে বাংলা ভাষার কবিতা লেখায়। অবশ্য তখন, এই বাংলায় হাজির হয়ে পড়েছেন কবিতা পড়ার আর-এক পারফরমার। যাঁরা ঐ একই সময়ে 'আবৃত্তি' নামক একটি শিল্প সম্ভাবনায় নিবিষ্ট হয়ে আছেন। মূলত: তাঁরা নাট্য কর্মী। আর কেউ কেউ সম্পূর্ণ নতুন এক শিল্প মাধ্যম বলেই ভাবছেন এই 'আবৃত্তি'কে, এখানে এঁদের কথাও একটু বলা দরকার।

৩.

স্কুল পাঠশালায় অথবা বিশ্বদ্যিালয় স্তরে কবিতা আবৃত্তির একটা সুযোগ থাকলেও পাবলিক পারফরম্যান্স এর স্তরে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প মাধ্যম হিসেবে আবৃত্তি উঠে আসতে থাকে ১৯৪০ এর দশকে। রেডিও সম্প্রচারেও কিন্তু ছয় এর দশকের আগে আবৃত্তি বিশেষ মর্যাদা পায় না। বিশশতকে চার এর দশকে IPTA আন্দোলনের সঙ্গে হয়তো কবিতা আবৃত্তির জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার একটা যোগ ছিলো। নাটকের সঙ্গে, নাট্যকর্মীরাই অনেকে কবিতা পাঠ এর একটা প্রস্তুতি শুরু করেন। আর এক্ষেত্রে অনেক সময়েই তাঁদের মূল নির্ভর হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের মনে পড়বে শ্রী শম্ভু মিত্র-র 'দুঃসময়' পাঠের অভিজ্ঞতা। ১৯৪৬ এ দেশ জোড়া দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে। মনে পড়বে ছয়ের দশকে করা ওঁর কবিতা আবৃত্তির রেকর্ডগুলির কথা অথবা পাঁচের দশকের গোড়ায় পড়া 'মধুবংশীর গলি' অথবা জীবনানন্দ পাঠ। একটি সাক্ষাৎকারে শ্রী শম্ভু মিত্র জানিয়েছেন এই আবৃত্তি 'কবিতা-করা'র চিন্তা ভাবনা। যে উদ্বেগ-এ যুক্ত হয়েছিল সময়ের সংক্ষিপ্ততা। এ ছাড়াও মনঃসংযোগ। এই কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় একটি নতুন শিল্প মাধ্যমের কথাই ভাবছেন তাঁরা যার উপস্থাপনার করণকৌশল তখনো নিষ্পন্ন হয়নি।

পাবলিক পারফরম্যান্স হিসেবে ১৯৬০ এর দশকে আস্তে আস্তে জায়গা পেতে থাকে আবৃত্তি। মূলতঃ কাজী সব্যসাচী আর শম্ভু মিত্র'র হাত ধরে। গানের অনুষ্ঠানে অথবা জলসা অনুষ্ঠানে শুরু হয় আবৃত্তি। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত অথবা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রখ্যাত অভিনেতারা আবৃত্তি অনুষ্ঠানেও অংশ নিচ্ছেন এই সময়ে। জনমানসে, বিশেষতঃ বাঙালী মধ্যবিত্ত সাধারণ্যে আবৃত্তি শোনার একটা রেওয়াজ দেখতে পাই এই দশকেই। রেডিও সম্প্রচারেও কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান বাড়তে থাকে। শুধু মাত্র আবৃত্তিকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবার দিন যদিও তখনো আসেনি।

এখানে আরো একটা প্রসঙ্গ তোলা চাই। কবিতা, কবিদের স্বকণ্ঠে শোনবার সুযোগও কিন্তু একই সঙ্গে বাড়ছে এই সময়ে। ১৯৫৪ সালে কলকাতার সেনেট হলে আয়োজিত হয় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সব থেকে বড় কবিতা পাঠের আসর! উদ্যোক্তা ছিলেন সিগনেট সংস্থার কর্ণধার ডি. কে. এর পর থেকে কবিদের কবিতা পাঠ শোনবার সুযোগ বাড়তে থাকে। ১৯৬০ আর ১৯৭০ এর দশকে কবিদের কবিতা পাঠ গোটা বাংলা জুড়েই ছড়িয়ে পড়ে। ছোট ছোট পত্রিকার উদ্যোগে এখানে ওখানে শুরু হয় কবিতা পাঠ সভা। কবিরাও এসে দাঁড়াচ্ছেন পারফরম্যান্স এর সামনে। ১৯৫৩ সালে 'কৃত্তিবাস' আর ১৯৫২ সালে 'শতভিষা' পত্রিকার আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কবিতা ততদিনে এসে দাঁড়িয়েছে নতুন সব প্রশ্নের সামনে!

এইখানেই 'কবিতা'কে ঘিরে একটা অনিবার্য বিতর্কের সম্ভাবনা তৈরী হয়ে উঠেছিল বাংলায়। বিষয়টা কবিতা লেখার দিক থেকে নয়, কবিতার উপস্থাপনা, অর্থ সঞ্চার আর সংযোগ নিয়ে। প্রশ্নটা ওঠে কবিদের তরফে। 'কবিতা'র নামে ঠিক কি পৌঁছে দিতে চাইছেন আবৃত্তি শিল্পী, সাধারণ মানুষের কাছে — এই ছিলো মূল প্রশ্ন।

সেই বিতর্কে পৌঁছনোর আগে দেখা দরকার কেমন ছিলো কবিদের সেই পারফরম্যান্স-এর ছবি। দুটো বিক্ষিপ্ত উদাহরণ নিয়ে বিষয়টা বোঝবার চেষ্টা করি। প্রথম উদাহরণ কবীর সুমনের বিখ্যাত একটি গান। কবি অরুণ মিত্র'র কবিতা পড়া নিয়ে। কবিতা নিয়ে নয় কিন্তু। সুমনের মতো একজন পারফরমার একটি 'কবিতা পড়া'র বিবরণ দিচ্ছেন গানের ভেতরে। পড়াটাই এখানে মূল অভিনিবেশের জায়গা!

পৃথিবী দেখছে আমাদের মুখে , বেলা অবেলার প্রতিচ্ছবি
নতুন একটা কবিতা পড়তে উঠে দাঁড়ালেন প্রবীন কবি
উঠে দাঁড়ালেন যেমন দাঁড়ায়, পুরোন মাটিতে গাছের চারা
সেই উত্থান দেখে নেয় শুধু মহাজীবনের সঙ্গী যারা।
উঠে দাঁড়ালেন যেমন দাঁড়ায় বন্দিনী এক বাঘিনী চিতা
চিড়য়াখানায় অসহায় তবু উঠে দাঁড়ানোয় অপরাজিতা !

এর পর একে একে আসতে থাকবে সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে বাঁধা উপমা।[২] 'সাধারণ লোক' 'প্রেমিক প্রেমিকা' সন্তানহারা মায়ের বাঁচা' আর শেষ পর্যন্ত ঃ

উঠে দাঁড়ালেন যেমন দাঁড়ায় চেনা কবিতায় অচেনা শব্দ
আবেগের কোনে অভিধান নেই তাই বেরসিক পাঠক জব্দ

শুধু কবির উঠে দাঁড়ানোই পৌঁছে গেল কবিতার ভেতর শব্দের উঠে দাঁড়ানোয় ! এই বর্ণনা কবির না পারফরমারের ?

আর এর একেবারে বিপরীত এক পারফরম্যান্সের উদাহরণ এবার তুলে নেব। লিখছেন জয় গোস্বামী, শক্তি চট্টোপ্যায়ের কবিতা পড়া নিয়ে। এক মফস্বলের মঞ্চে যেখানে হাজির শক্তি। মত্ত এক পারফরমার।

"কোনও কবি সম্মেলনে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা হওয়া মাত্র হল-এর মধ্যে বিরাট চিৎকার ও হল্লা শুরু হয়ে যেত। সেই সভা আরও এক-দেড় ঘন্টা সময় অতিক্রম করেছে ততক্ষণে। কিন্তু সবাই চুপচাপ ছিলো। .... যখন নাম ঘোষণা হলো তখন তো হইহই। তিনি যখন হল-এ ঢুকছেন, সঙ্গে একদল যুবক। টলতে টলতে স্টেজে উঠলেন। একবার মনে আছে, শক্তি মঞ্চে উঠেই বললেন : নামিয়ে দাও, ওটা নামিয়ে দাও। বলেই স্টেজের ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন। মাইক্রোফোনের লোকটি কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ... একটু আগেই হুড়মুড় করে ঠিক আমার সামনে সারিতে এসে বসে পড়েছিলো দু'জন। তারা বলল : "ওহ্ এই হচ্ছে শক্তি দা !"[৩]

৪.

এই হচ্ছে এক পরিস্থিতি যেখানে 'কবি', বস্তুত আধুনিক কবি, তৈরী করে তুলছেন পারফম্যান্স-এর এক প্রতিস্পর্ধী নিয়ম। এক অন্যরকম আয়োজন। এই নতুন চিন্তারই এক সূত্র পাওয়া যাবে ছোট্ট এক বিবরণে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁকে ঘিরে এক অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান চলছে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে। অনেক মানুষের মধ্যে এসে পড়েছেন স্বয়ং শম্ভু মিত্র। পড়বেন তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর কবিতা। উপস্থিত দর্শকরা সহর্ষে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন তাঁকে। কবিতা পড়া শেষ করে মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন যখন শম্ভু মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্মিত হেসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। আবৃত্তি কেমন লাগলো জানতে চাইছেন শম্ভু মিত্র। সুভাষ জানালেন : ভালো, তবে আমি পড়লে বোধহয় আর একটু ভালো হত ! 'ও' তাই বুঝি !' বলেই বেরিয়ে যাচ্ছেন আবৃত্তিকার। সুভাষ আর একটু স্মিত হেসে সঙ্গীকে জানালেন : এই কবিতাগুলো তো সামান্য, সাধারণ কথা। ওইভাবে বললেই তো হয় ![৪]

এই কথাটার আরো একটু পরিচয় পাওয়া যাবে শ্রী শঙ্খ ঘোষের অনেক গুলো লেখায়। মূল বিকর্তটির পরিচয় আছে নিঃশব্দের তর্জনী বইটির, 'কবিতা পড়া : কথা ও সুর' এই প্রবন্ধে। ১৯৭০ সালে লেখা প্রবন্ধটি ছাড়াও রয়েছে 'জার্নাল'-এর 'আবৃত্তিকথা' নামের ছোট্ট লেখাটি। ছোট্ট কয়েকটি উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে ওঁর মূল কথা গুলো তুলে আনছি :

১. বিনয় মজুমদার একা একা তাঁর কবিতা পড়ছিলেন কফি হাউসের একান্তে, ... ভারি যত্নে আলাদা করে উচ্চারণ করছিলেন এক-একটি শব্দ। একটু জোর দিয়ে, আর হঠাৎ কখনো থেমে থাকছিলেন অনেকক্ষণ। যেন একটা শব্দ তিনি নূতন দেখলেন এখানে, কী ভেবে শব্দটি এখানে বসিয়েছিলেন যেন তাই ভেবে নিলেন একটু। তার পর, যেন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে, আবার শুরু করলেন তাঁর পড়া, তখন যেন গোটা ব্যাপারটার মানে পেয়ে গেছেন তিনি। .... বুঝে নিলাম যে এই পড়াটা আসলে নিজের সঙ্গে নিজেরই একটা বোঝাপড়া মাত্র।[৫]

২. কবিতার ইস্‌থেটিক্‌স আর কবিতার আবৃত্তিতে প্রায়ই দেখি একটা বিচ্ছেদ ঘটে যায়।[৬]

৩. আবৃত্তিকে যাঁরা নিতান্ত ব্যসন হিসাবে ব্যবহার করেন, যাঁদের গলা ভালো কিংবা গলাখেলানো ভালো, ... তাঁর কবিতার গদ্য অন্বয়টাকে মাত্র লক্ষ্যে রাখেন, সেইটেকে শ্রোতার কাছে সকারিত করতে পারলেই তাঁদের সফলতা। কবিতা যে তার চেয়ে বেশি কিছু, এটা বুঝে নেওয়া তাঁদের পক্ষে বেশ একটু শক্ত।[৭]

এই সমস্তটাকেই শঙ্খ ঘোষের মনে হচ্ছে 'শৌখিন ভঙ্গি মাত্র, আসর জমাবার ফিকির।' মনে হচ্ছে আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে 'কবিতাটি শেষ অবধি পৌঁছয় না হয়তো, শ্রোতার কাছে। পৌঁছয় কেবল আবৃত্তিকারের একটা নাটুকে আবেগ'! আর 'নাটক'ই হচ্ছে কবিতা আবৃত্তির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ স্বাভাবিক এক বাক্‌স্পন্দই, শ্রী শঙ্খ ঘোষের মতে আধুনিক কবিতার, অথবা, কবিতার আধুনিকতার সবচেয়ে বড় পরিচয়। এই ভাবে কবি স্বয়ং গড়ে তুলছেন 'কবিতা পড়া' কাজটার এক ভেতরকার নিয়ম। যা আবৃত্তিকার ধরতে চাইছেন বাইরের নিয়ম, মাপা নিয়ম দিয়ে।

এইটেই যে একমাত্র মত তা নয়। কবিরা যে তাঁদের কবিতা পড়া বা কবিতা নিয়ে ভাবছিলেন তা জানতে পারার নানা সূত্র আছে। আমি এখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি সাক্ষাৎকার পেশ করছি। যেখানে শক্তি জানাচ্ছেন, তাঁর বিখ্যাত 'অবণী বাড়ি আছো' কবিতাটিতে শেষ পর্যন্ত তিনি যে আবহাওয়া তৈরী করতে চান সেটা বন্ধ বাড়ির আর তাই চীৎকার করে ডাকতে থাকেন কবিতার শেষে। কারণ এই যে 'আমি', কবিতার 'আমি' সেওতো এক বন্ধ বাড়ির মতোই! শক্তি জানাচ্ছেন, তাঁর এই রকম কিছু কবিতা আছে সভায় পড়বার মতো। সব কবিতা, সভায় বা আসরে পড়বার মতো নয়— যেমন সনেট। অর্থাৎ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে কবিতার পারফরম্যান্স-এর নির্বাচন আছে। যা হয়তো শঙ্খ ঘোষের কাছে গ্রহণীয় নয়। এই খানে দেখবার এটুকুই যে কবিরা কি শুধুই কবিতা লেখা কাজটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেছেন নিজেকে, শক্তি, যখন নিজের লেখা নিয়ে সন্ধিহান হয়ে পড়েছেন, তিনি লিখছেন ঃ

গতরাতে শেষ করা পদ্যটির তুমুল উত্তাপ
এখন পারি না দিতে সভাঘরে, বিশিষ্ট শ্রোতাকে।

এখানে দেখবার মতো, কবি তার কবিতা লেখার *'তুমুল উত্তাপ'* দিতে চাইছেন *'বিশিষ্ট শ্রোতাকে'*! কবি-পাঠক এই চলাচলের পথে এখানে জুড়ে যাচ্ছে পারফরমার-শ্রোতার আবর্তটিও! কবিতা, কবিতা লেখা, কবিতা পড়া সব মিলিয়ে হয়ে উঠছে এক শক্তি ক্ষেত্র যেখানে অর্থ উৎপাদনের একটা ক্রিয়া চলছে। আর সেই ক্ষেত্রটিতে পারফরমারই হয়ে উঠতে চাইছেন কবির নিয়ন্ত্রক আর কবি কবিতার ভেতরের নিয়ম গুলো প্রতিষ্ঠা করে নিজেই হতে চাইছেন এক সম্পূর্ণ স্বাধীন পারফরমার! এর ভেতর তৈরী হয়ে উঠছে বাংলা কবিতার এক অত্যাবশ্যক তর্ক কবি বনাম আবৃত্তিকার। যে তর্ক এখনো শেষ হয়েছে বলে মনে হয় না।

তথ্যসূত্র ঃ

১। এলিয়ট ও তাঁর কবিতা; ভূমিকা, বিষ্ণু দে, সিগনেট ২০১০, কলকাতা ও জীবনের রঙে; ফরাসি মননের আলো, অরুণ মিত্র, অভিজাত প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ-৮১-১১৬; কলকাতা

২। 'ইচ্ছে হল'; 'পৃথিবী দেখছে আমাদের মুখে', সুমন চট্টোপাধ্যায় (কবীর সুমন), সারেগামা, ১৯৯৩, কলকাতা

৩। 'জয়ের শক্তি', বোহেমিয়ান, জয় গোস্বামী ২০১৬, কলকাতা, পৃ-৭০

৪। 'সামান্য অসামান্য', সুভাষদার সঙ্গে পথচলা, শঙ্খ ঘোষ, প্যাপিরাস ২০০৬, কলকাতা, পৃ: ৫৫-৬০

৫। 'নিঃশব্দের তর্জন', 'কবিতা পড়া কথা ও সুর', শঙ্খ ঘোষ, প্যাপিরাস ১৩৮৪, পৃ-৫৫-৬০

৬। তদেব, পৃ-৫৫-৬০

৭। জার্নাল, আবৃত্তিকথা, শঙ্খ ঘোষ, দে'জ, ১৯৮৪, পৃ-৮২